Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Rabindranath Tagore's Shyamoli : A Unity of Romantic Imagination

রবীন্দ্রনাথের শ্যামলী কাব্য : রোমান্টিক চিত্রকল্পের এক সমন্বয়

Swarup Dey
ড. স্বরূপ দে
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Abstract

Rabindranath Tagore was a great humanitarian and a romantic poet as well. Tagore holds a highest position in the realm of Bengali poetry. He has written many romantic poems in his carrier. Among them 'Shyamoli' is the most important. In this collection of poems, 'Shyamoli', Tagore has drawn a marvellous picture of romanticism as well as of romantic emotion. In the poetry like 'Manasi', 'Prabhat Sangit' the idealism about love has been reflected in an unique way. In 'Shyamoli' the grown up hind of Rabindranath Tagore has recognized an identified love in a more matured way. In it love and tragedy have been lingted up in a most beautiful way. In the realm og Tegorian poetry 'Shyamoli' has turned into a monument of love.

Keywords: Rabindranath Tagore, Shyamoli, Romantic Imagination

Article

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ খ্রি. - ১৯৪১ খ্রি.) মানবমনের কবি তথা মানববাদী কবি। তার দক্ষতা মানবমন ও মানবরসের বস্তু সঞ্চয়ে। তাঁর জীবন ভাবনা, জীবনদর্শন শুধু নিজ ব্যক্তিগত জীবনের আকর নয়, তা সার্বজনীন মানবমনের প্রকাশ। তাই তাঁর জীবনের দর্শন, জীবনের গতিমুখতা বিচিত্র ধারায়, বিচিত্র সজ্জায় সমাহিত। একটি মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের চিত্র ধরা পড়েছে তাঁর কাব্য-কবিতায়। সমালোচকের কথায় :

"রবীন্দ্রনাথের কাব্য- প্রতিভার প্রধান ধর্ম ইহার মানবমুখিতা;
কালিদাসের পর এত বিরাট মানবমুখী কবি প্রতিভা
আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী কবি, লৌকিক কবি। তাঁর কাব্যে, তাঁর কবিতায় তাই বাস্তবধর্মী মানব- চিন্তনের প্রকাশ। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাঁর লৌকিকতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "এই লৌকিক কবিদের মধ্যে প্রতিভার সাধর্মে ও বিরাটত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়; সে ধর্মটি মানবমুখীতা।"[২]

বর্ণপরিচয় এর লেখা 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' শব্দবন্ধের প্রাকৃতিকতা তাঁর কৈশোর জীবনের মানসিকতার তরঙ্গপটে আকস্মিকতা জাগায়। বিস্ময়ে অবিভূত করে রবীন্দ্রনাথের মানসপটকে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রচিত অভিলাষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে রবীন্দ্র জীবন ও রবীন্দ্র কবিতা এক ও একাত্ম হয়ে ওঠে। বারবার পট পরিবর্তন হয় জীবন ও কবিতার ধারা। রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় তার কথা নিজেই অকপটে স্বীকার করেন । তিনি বলেন :

" আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে।
প্রায় সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের
ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু জোগান নতুন পথ নেয়।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার জগৎ বড় বিচিত্র। 'বনফুল' (১৮৭৫ খ্রি.) 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২ খ্রি.), 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৩৩ খ্রি.), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪ খ্রি.) 'ও কড়ি ও কমলের' (১৮৮৬ খ্রি.) মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র কাব্য চর্চার যে বিকাশ 'মানসী' (১৮৯০ খ্রি.) 'সোনার তরী' (১৮৯৪ খ্রি.) 'চিত্রা' (১৮৯৬ খ্রি.) 'চৈতালীর' (১৮৯৬

খ্রি.) মধ্য দিয়ে তার ক্রম-অগ্রগতি। 'কাহিনী' (১৯০০ খ্রি.), 'শিশু' (১৯০৬ খ্রি.), 'খেয়া' (১৯১০ খ্রি.) এর মধ্য দিয়ে 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০ খ্রি.), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪ খ্রি.) 'বলাকা'র (১৯১৬ খ্রি.) পথে যাত্রা। পরে পলাতকা (১৯১৮ খ্রি.), 'পুনশ্চ' (১৯৩২ খ্রি.) 'শ্যামলী'র (১৯৩৬ খ্রি.) মধ্য দিয়ে পূর্ণতার দীর্ঘতর রূপের প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য জগৎকে বিভিন্ন পর্যায় তথা পর্বে ভাগ করা যায়। এই পর্ব তথা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র মননের চিন্তা-ভাবনার পরিসরকে চিনে নেওয়া যায়। 'মানসী', 'গীতাঞ্জলি', বলাকার মতো 'পুনশ্চ' পর্বের কাব্য গুলিতে রবীন্দ্র-মনন ও চিন্তনের অনেক বিচিত্র কথা উঠে এসেছে। আর এই 'পুনশ্চ' পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য হল শ্যামলী।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ আকারে প্রকাশ পায় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। 'শ্যামলী'র কবিতাগুলি ১ ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ থেকে ৬ আগস্ট ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। এই কাব্যের কবিতার সংখ্যা কুড়ি অধিক। এই কাব্যের বেশিরভাগ কবিতাগুলি তিনি শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলেন। কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন বরানগরে বসে। 'পুনশ্চে' যেমন তিনি দৈনন্দিন জীবন ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন, 'শেষ সপ্তক' এ শৈশবের কথা স্মৃতিচারণা মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, 'পত্রপুটে' মানুষের কথা মনুষ্যত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তেমনই 'শ্যামলী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মেয়ের কথা তার ভালোলাগা ভালোবাসা রোমান্টিক আবেগের কথা ব্যক্ত করেছেন।

'শ্যামলী' কাব্য রোমান্টিক ভাবনার এক আশ্চর্য সমন্বয়। যে রোমান্টিক সত্তায় একদিকে যেমন কবির আবেগ, কবির ভালোবাসা, যেমন জড়িয়ে রয়েছে, তেমনি বাঙালি তথা বাংলাদেশের প্রেমিক-প্রেমিকা, যুবক- যুবতীর হৃদয়ের যৌবনের সুতীব্র আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেও প্রেম ভাবনা বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র পরিসর লাভ করেছে। সময়ে সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেম হয়েছে নিত্য নুতন নিত্য অভিনব। রবীন্দ্রনাথের কাছে যৌবনের প্রেমের সঙ্গে মধ্যবয়সি রবীন্দ্র প্রেম ভাবনার মধ্যে তারতম্য ঘটেছে। 'মানসী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনা আরও দীর্ঘতর হয়েছে 'শ্যামলী' কাব্যে প্রেম ভাবনার মধ্যে। 'মানসী' কাব্যের 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় প্রেম, রোমান্টিকতার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার।
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার।"[৪]

সেই প্রেম ভাব নারী যেন পরিণত রূপ আমরা পাই শ্যামলীর 'শেষ প্রহরে' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"চুপচাপ চারি দিক
যেমন চুপচাপ পাখি হারা পাখির বাসা
গান হারা গাছের ডালে।
.....
ভোর বেলাকার ফ্যাকাশে আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে পাণ্ডাশ বরণ শূন্য জীবনে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ প্রেম কে বারে বারে নতুন করে চিনেছেন। প্রেমের গভীরতা কেউ চিনেছেন নতুন করে বার বার। কখনও পুরুষের চোখে আবার কখনো নারীর চোখে তিনি প্রেম কে দেখেছেন ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি ভাবে। তাই সমালোচক বলেন :

"তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমান এর দ্বারা, কল্পনার দ্বারা,
আভাসে যেটুকু পাইয়াছেন তার দ্বারা, ভিতরের জীবনযাত্রার
চিত্র আঁকতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কবি প্রতিভা সারা
জীবন এই দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, এখনো করিতেছে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী' কাব্যে প্রেম, রোমান্টিকতার এক আশ্চর্য চিত্রকল্প রচনা করেছেন। যেখানে চিরন্তন বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ের আবেগি প্রেম থেকে শুরু করে, চিরন্তন প্রেম সত্তার সর্বিকতা প্রকাশ পেয়েছে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র 'মরণ' কবিতা রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে :

"মরণ রে

তুহু মম শ্যামসমান।

মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটা জুট,

রক্তকমলকর, রক্ত অধরপুট,

তাপবিমোচন করুন কোর তব

মৃত্যু অমৃত করে দান

তুহু মম শ্যামসমান।"[৭]

'শ্যামলী'র সম্ভাষণ কবিতায় যেন তারই প্রকাশ :

"রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে,

বলি চারু।

হঠাৎ ইচ্ছে হলো আর - কিছু বলি,

যাকে বলে সম্ভাষণ।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী' কাব্যে যে চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন, তা কথার দ্বারা শাব্দিক চিত্রকল্প। যে চিত্রকল্পের ভাবনার পরিসর কবির অন্তর সত্তার মধ্যে গ্রথিত। কথার দ্বারা, ভাষা দ্বারা, শব্দের দ্বারা শ্যামলী কাব্যের চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে রোমান্টিকতা, আবেগি প্রেমের চিরন্তনতা। প্রেম যে সব সময় রূপময় নয়, প্রেম ময় নয়, তার মধ্যেও যে বিরহ আছে সে ভাবনাও স্ফুরিত হয়েছে শ্যামলী কাব্যের কবিতায়। কবি বলেছেন :

"আজ কোন - সীমানা - দেওয়া নয় আমার মন,

হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।

আগেকার চিহ্ন গুলো সব গেছে মুছে,

আমাকে অ্যাড করে নিতে পারবে না কোন খানে

কোন বাঁধনে বেঁধে।"[৯]

এ যেন মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চন্ডীদাসের পদ এর পুনরাবৃত্তি চন্ডীদাসের রাধা সেখানে বলে :

"বন্ধু সকলেই আমার দোষ।

না জানিয়া যদি করাচি পিরিতি

কাহারে করিব রোষ।"[১০]

চিরন্তন প্রেম ও ট্রাজেডি প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন ঘটেছে 'শ্যামলী' কাব্যের মধ্যে। 'শ্যামলী' কাব্যের যেসব কবিতার মধ্যে বেশি করে এই রোমান্টিকতার চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে তা নিম্নে উল্লেখিত হল :

১) আমি (২৯ মে, ১৯৩৬ খ্রি.)

২) সম্ভাষণ (৩০ মে, ১৯৩৬ খ্রি.)

৩) স্বপ্ন (৩০ মে, ১৯৩৬ খ্রি.)

৪) হারানো মন (১ জুন, ১৯৩৬ খ্রি.)

৫) বাঁশিওয়ালা (১৬ জুন, ১৯৩৬ খ্রি.)

৬) হঠাৎ দেখা (২৪ জুন, ১৯৩৬ খ্রি.)

৭) শ্যামলী (৬ আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রি.)

আমি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রমনের তথা মননের পরিচায়ক। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিক সত্তার সঙ্গে বাহ্যিক প্রাকৃতিক সত্তাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। নিজের সত্তার মাধ্যমে, কিভাবে জগতকে উপলব্ধি করা যায়, নিজের ভাবনাকে কিভাবে জগতের মধ্যে, সমাজের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'আমি' কবিতা। তিনি কবিতায় বলেছেন :

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ

চুনি উঠিল রাঙা হয়ে।

আমি চোখ মেললুম আকাশে,

জ্বলে উঠলো আলো

পূবে পশ্চিমে।"[১১]

রোমান্টিকতার স্পর্শ আমি কবিতায় পাওয়া যায়। তাত্ত্বিকদের সঙ্গে কবিদের তফাৎ বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবি-হৃদয়ের রোমান্টিকতার চিত্র তুলে ধরেন। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"সেই আমির গহনে আলো আঁধারের ঘটল সংগম,

দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।

না কখন ফুটে ওঠে হল হা মায়ার মন্ত্রে

রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।"[১২]

সম্ভাষণ কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ শান্তিনিকেতনে লিখেছিলেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ প্রেমের মধুরতা প্রকটতাকে প্রকাশ করেছেন। কবিতার পলকে পলকে রোমান্টিকতা স্পর্শ অনুভূত হয়। একজন সাধারণ বাঙালি গৃহবধূ, তার পতির জন্য, প্রেমিকের জন্য কিভাবে প্রতিনিয়ত নিজেকে নিত্য নুতন রূপে সাজিয়ে তোলে তারই পরিচয় পাওয়া যায় কবিতাটিতে। যেখানে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে চিরনতুন হিসাবে পেতে চেয়ে বলে :

"রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে,

বলি চারু।

হঠাৎ ইচ্ছা হল আর কিছু বলি,

যাকে বলে সম্ভাষণ,

যেমন বলত সত্যযুগের ভালোবাসায়। সব চেয়ে সহজ ডাক - প্রিয়তমে।"[১৩]

প্রেমিকাও নিরাশ করেনি প্রেমিক পুরুষের এই ঐকান্তিক ইচ্ছাকে। নিতান্ত সাধারণ একজন বাঙালি গৃহবধূ, দিনের রোজনামচার সাধারণ হিসেব থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে সাজিয়ে তোলে পুরুষের জন্য। নিজেকে সাজিয়ে তোলে নতুন ভাবে, নতুন রূপে ও নতুন ঢঙে। কবিতায় পাই :

"বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে

বেনী পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁটা বিঁধে বিঁধে।"[১৪]

রোমান্টিকতার এ এক অপূর্ব নিদর্শন নিঃসন্দেহে। 'স্বপ্ন' কবিতাতেও রোমান্টিকতার, প্রেম ভাবনার চিত্রকল্প খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে, ৩০ মে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন। এই কবিতায় প্রেমের মাধুর্য্য কে তুলে ধরতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"মুখচোরা সেই মেয়ে,

চোখে কাজল পরা,

ঘাটের থেকে নীল শাড়ি

নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা।"[১৫]

রোমান্টিক প্রেম ভাবনার আর এক নিদর্শন 'শ্যামলী' কাব্যের 'হারানো মন' কবিতাটি। কবিতাটি ১৯৩৬, শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলেন। কবিতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন প্রেমের বন্ধন ও বিরহের চিত্র কে তুলে ধরেছেন। প্রেমিক কবি চুড়ির শব্দে, শাড়ির ভাঁজে, পায়ের দ্বিধায় প্রেমিকাকে উপলব্ধি করেছেন। প্রেমিকাকে উপলব্ধি করেছেন কৃষ্ণপক্ষের নীহারিকা বর্ষশেষের সাদা মেঘের সঙ্গে। কবি বলেছেন :

"এক বার একটু শুনেছি চুড়ির শব্দ।

তোমার ফিকে পাটকিলে রঙের আঁচলের একটুখানি

দেখা যায় উড়ছে বাতাসে

দরজার বাইরে।"[১৬]

প্রেমের মধ্যে বিরহ চিরন্তন। বিরহ-ই প্রেমকে আরও বেশি গভীর করে, প্রেমকে পূর্ণতা দেয়। সেই বিরহের অসাধারণ উপমা পাই কবিতায় :

"আমার ভালোবাসা

যেন সেই আল ভেঙে যাওয়া খেতের মতো।"[১৭]

তাই কবি প্রেম ও বিরহকে একাত্ম করে চিরন্তনতার বাণী প্রকাশ করেছেন কবিতার শেষ ছত্রে। কবি বলেছেন :

"আজ কোন সীমানা দেওয়া নয় আমার মন,

হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।"[১৮]

'বাঁশিওআলা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ১৬ জুন ১৯৩৬, শান্তিনিকেতনে লিখেছিলেন। এক নিতান্ত সাধারণ বাংলাদেশের মেয়ে কিভাবে তাঁর প্রেমাস্পদের স্পর্শে, ছোঁয়ায় রঙিন হয়ে উঠেছিল, তারই প্রকাশ এই কবিতাটিতে। কবির প্রেমিকা বলেছেন :

"এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি

ভরা জীবনে সুরে

মরা দিনের নাড়ির মধ্যে

দবদবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।"[১৯]

প্রেমিকের স্পর্শে প্রেমিকা শুধু জীবনের রঙিনতা পেয়েছে তা নয়, পেয়েছে সে বাঁচার নতুন স্বাদ, নতুন শক্তি। তাই কবিতায় সেই প্রেমিকাকে বলতে শুনি :

"আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর

ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,

পাঁজরের উপরে আছাড় খাওয়া

মরণ - সাগরের ডাক,

ঘরের শিকল - নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।"[২০]

এই কবিতার শেষ দুটি স্তবকে প্রেমের মধ্য দিয়ে, প্রেমের শক্তির মধ্য দিয়ে বাঙালী নারী জাগরণের কথাও ঘোষণা করেছেন খুব সংযত ভাবে। তাই কবির প্রেয়সী নারীকে বলতে শুনি :

"তোমার ডাক শুনে একদিন

ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে

অন্ধকার কোন থেকে

বেরিয়ে এলো ঘোমটা খসা নারী।"[২১]

রোমান্টিক প্রেমের চিত্রকল্পের আর দুই নিদর্শন 'হঠাৎ-দেখা' ও 'শ্যামলী' কবিতা দুটি। দুটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলেন। হঠাৎ - দেখা কবিতা রবীন্দ্রনাথ রেলের কামরায় দুটি প্রেম সত্তাকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন সমাজের ঊর্ধ্বে প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে। তারই সঙ্গে প্রেমের অকুতোভয় জিঘাংসাকে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই কবির বাণীতে পাই ক্ষুরধার সাহসী আগমনের ডাক :

"এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে

মনে হল কম সাহস নয়;

বসলুম ওর এক - বেঞ্চিতে।"[২২]

তাই কবিতায় দেখি সেই আপ্ত-বাক্যের কথা :

"রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।"[২৩]

'শ্যামলী' কবিতাতেও শ্যামলী হয়ে উঠেছে চিরন্তন নারী। সেই নারী কখনও একাত্ম হয়ে আছে প্রকৃতির সঙ্গে। নারী ও প্রকৃতি যেন এক লহমায় এক হয়ে আছে।

"পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা, শ্যামলী,

তুমি দেবতাপাড়ার বেদের মেয়ে।"[২৪]

আমি, 'হঠাৎ-দেখা', 'শ্যামলী', 'বাঁশিওয়ালা', 'সম্ভাষণ', 'স্বপ্ন' কবিতা গুলি যেমন 'শ্যামলী' কাব্যের প্রেম ভাবনা রোমান্টিক মায়াবী চেতনা প্রকাশ করে। তেমনি এই কাব্যের অন্য কিছু কবিতা রোমান্টিক প্রেম ভাবনার প্রকাশ মেলে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'দুর্বোধ', 'অমৃত', 'কালরাত্রে', 'কনি', 'মিল ভাঙা' কবিতাগুলি। কথার চিত্রকল্পের দ্বারা 'শ্যামলী' কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার মায়ামন্ত্রে জড়িয়ে দিয়েছেন। যা শুধু চমকপ্রদ নয়, তা প্রেম সত্তার নিগুঢ় সৌধ।

তথ্যসূত্র

১. বিশী, প্রমথনাথ : ভূমিকা, রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রাবণ ১৪১২ কলকাতা - ৭৩ পৃষ্ঠা - ১ (ভূমিকা)।
২. বিশী, প্রমথনাথ : ভূমিকা, রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তদেব, কলকাতা - ৭৩ পৃষ্ঠা - ১ (ভূমিকা)।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নবজাতক, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অনন্ত প্রেম, মানসী, সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৬৬।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : শেষ প্রহর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪১।
৬. বিশী, প্রমথনাথ : ভূমিকা, রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তদেব কলকাতা - ৭৩ পৃষ্ঠা - ২ (ভূমিকা)।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : মরণ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সম্ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, ফাল্গুন, ১৪২২ কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪৩।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : হারানো মন, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫০।
১০. গিরি, সত্য (সম্পাদনা) : বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, ফেব্রুয়ারি ২০১০, কলকাতা - ৯ পৃষ্ঠা - ২৯১।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : আমি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাগুন ১৪২২ কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪২।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : আমি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪২।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সম্ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৩।
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সম্ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৪।
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : স্বপ্ন, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৪।
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : হারানো মন, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪৯।
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : হারানো মন, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৯।
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : হারানো মন, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫০।
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বাঁশিওয়ালা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৬৪।
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বাঁশিওয়ালা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৫।
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বাঁশিওয়ালা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৬।
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : হঠাৎ-দেখা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাগুন ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৭০।
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : হঠাৎ-দেখা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭১।
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : শ্যামলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন, ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৮৪।